রমজান মাসের করণীয় বর্জনীয়

হিজরী বছরের অত্যান্ত মূল্যবান মাস হলো এই রমজান মাস। এই মাসের প্রতিটি মূহুর্তকেই আমল দিয়ে সাজানো হয়েছে। যদিও আমরা গুটিকয়েক আমল দিয়ে এই মাস অতিবাহিত করার চেষ্টা করি। কিন্তু সত্যিকার অর্থে কেউ যদি আল্লাহর অলী হতে চায় তাহলে এটা একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স। এই মাসকে অলী হওয়ার সংক্ষিপ্ত কোর্স বলা হয়েছে। আরো একটি বিষয় হলো এই মাসকেই মানুষ যাকাত দেয়ার মাস মনে করে থাকে যদিও তা ঠিক না। তাই এই মাসের আমলের আলোচনাতে যাকাতের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। এই মাসের আলোচ্য বিষয়সমূহঃ

ক. রোযার ফযীলত ও জরুরী মাসাইল
খ. তারাবীর নামায
গ. শবে ক্বদর
ঘ. যাকাত
ঙ. ঈদের চাঁদের শর'ঈ বিধান

ক. রোযার ফযীলত ও জরুরী মাসাইল

১. রোযার গুরুত্ব ও ফযীলত

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: (তরজমা) হে মুমিন সকল! তোমাদের উপর রমাযানের রোযা ফরয করা হলো, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল। যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। (সূরা বাকারা-১৮৩)

হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত সওয়াবের আশায় রমাযান শরীফের রোযা রাখে, (অন্য বর্ণনায়) ঈমানের সহিত সওয়াবের আশায় তারাবীহের নামায পড়ে, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। (বুখারী শরীফ: হা: নং ১৯০১)

রোযার নিয়ত

রমাযানের রোযার জন্য সুবহে সাদিকের পূর্বে মনে মনে এই নিয়ত করবে যে, 'আমি আজ রোযা রাখবো' অথবা দিনে আনুমানিক ১১টার পূর্বে মনে মনে এইরূপ নিয়ত করবে যে, আমি আজ রোযা রাখলাম। মুখে নিয়ত করা জরুরী নয়, বরং মুস্তাহাব। (রদ্দুল মুহতার: ২/৩৭৭)

বি. দ্র. : আরবী ভালভাবে বলতে পারলে ও বুঝলে আরবীতেও নিয়ত করতে পারবে। অন্যথায় বাংলায় নিয়ত করা ভালো।

সাহরী ও ইফতার

রোযাদারের জন্য সাহরী খাওয়া ও ইফতার করা সুন্নাত। বিশেষ কিছু না পেলে সামান্য খাদ্য বা কেবল পানি পান করলেও সাহরীর সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

ইফতার খুরমা কিংবা খেজুর দ্বারা করা সুন্নাত। তা না পেলে পানি দ্বারা ইফতার করবে। ইফতারের কিছুক্ষণ পূর্বে এ দু'আটি বেশী বেশী পড়বে:

يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْلِيْ

অর্থঃ হে মহান ক্ষমা দানকারী! আমাকে ক্ষমা করুন। (শু'আবুল ঈমান: ৩/৪০৭)

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى بَرَكَةِ اللهِ

বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ। বলে ইফতার শুরু করবে এবং ইফতারের পর নিম্নের দুটি দু'আ পড়বে:

১. اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

(অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রোযা রেখেছি, এবং তোমারই দেয়া রিযিক দ্বারা ইফতার করলাম।) (আবূ দাউদ: ১/৩২২)

২. ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى

(অর্থঃ পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, ধমনীসমূহ সতেজ হয়েছে, এবং ইনশাআল্লাহ রোযার সওয়াব নিশ্চিত হয়েছে।) (আবূ দাউদ: ১/৩২১)

৩. ইফতারীর দাওয়াত খেলে মেজবানের উদ্দেশ্যে এই দু'আ পড়বে:

اَفْطَرَعندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملئكة

(অর্থঃ আল্লাহ করুন যেন রোযাদারগণ তোমাদের বাড়ীতে রোযার ইফতার করে এবং নেক লোকেরা যেন তোমাদের খানা খায় এবং ফেরেশতাগণ যেন তোমাদের উপর রহমতের দু'আ করে।) (আস্সুনানুল কুবরা, নাসাঈ ৬:৮১, ইবনুস সুন্নীঃ ৪৩৩)

রোযার গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল

১. রমাযানের প্রত্যেক দিনেই ঐ দিনের রোযার নিয়ত করা জরুরী। একদিনের নিয়ত পুরো মাসের রোযার জন্য যথেষ্ট নয়। (দুররে মুখতার: ২/৩৭৯)

২. যদি কেউ রোযার নিয়ত ব্যতীত এমনিতেই সারা দিন না খেয়ে থাকে, তাহলে এটা রোযা বলে ধর্তব্য হবে না। (রদ্দুল মুহতার: ২/৩৭৭)

৩. সুবহে সাদিকের পর খানা-পিনা জায়িয নেই। আযান হোক বা না হোক। লোক মুখে যে প্রচলিত রয়েছে যে, সুবহে সাদিকের পরেও আযান পর্যন্ত খাওয়া যায় তা সম্পূর্ণ ভুল। (রদ্দুল মুহতার:২/৪১৯)

৪. রোযা অবস্থায় গোসল করলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। তবে কুলী করার সময় গড়গড়া করবে না এবং নাকে পানি দেয়ার সময় নাকের মধ্যে জোরে পানি টানবে না। (দুররে মুখতার: ২/৪১৯)

৫. রোযা অবস্থায় কাউকে রক্ত দিলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। যদি রক্তদাতার শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকে।(রদ্দুল মুহতার: ২/৪১৯)

৬. রমাযান মাসের দিনে বা রাতে কেউ যদি বেহুঁশ হয়ে যায় এবং তা যদি কয়েকদিন বা অবশিষ্ট পুরো মাস পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে প্রথম যে দিন বেহুঁশ হয়েছে ঐ দিন বাদ দিয়ে বাকী দিনগুলির রোযার কাযা করতে হবে।(দুররে মুখতার: ২/৪৩২)

৭. রমাযান মাসে কেউ যদি পাগল হয়ে যায় তাহলে তার রোযা মাফ হয়ে যায়। তবে পুরো মাসের কোন অংশে সুস্থ হলে পূর্বের রোযাগুলোর কাযা করতে হবে।(আল বাহরুর রায়েক: ২/৫০৭)

৮. হস্তমৈথুন করলে রোযা ভেঙ্গে যায় এবং তার কাযা আদায় করা জরুরী। এটা জঘন্য পাপকার্য। হাদীসে এইরূপ ব্যক্তির উপর লানত করা হয়েছে। (দুররে মুখতার: ২/৩৯৯)

৯. যদি রোযা অবস্থায় দাঁত দিয়ে রক্ত বের হয়েছে কণ্ঠনালীতে পৌঁছে যায় এবং তা পরিমাণে কম হয়, তাহলে রোযা নষ্ট হবে না। আর যদি রক্ত থুথুর সমান বা থুথু থেকে বেশী হয় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। এবং তার কাযা করতে হবে। (দুররে মুখতার: ২/৩৯৬)

১০. বাচ্চাকে দুধ পান করালে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু নামায অবস্থায় দুধ পান করালে নামায ভেঙ্গে যায়। (দুররে মুখতার: ২/৩৭১)

১১. সফরে যদি কষ্ট হয় তাহলে রোযা না রাখা জায়িয আছে বরং না রাখা উত্তম। আর সফরে কষ্ট না হলে রোযা রাখাই হল মুস্তাহাব। তবে রোযা রেখে ভাঙ্গা ঠিক নয়। কেউ যদি ভেঙ্গে ফেলে তাহলে কাফফারা আসবে কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। যদিও গ্রহণযোগ্য মত হল যে, এই সূরতে কাফফারা ওয়াজিব হয় না। (আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৪৪)

১২. কেউ রোযা রাখার পর মারাত্মক অসুস্থ হয়ে গেলে অথবা পূর্বের রোগ বেড়ে যাওয়ার প্রবল ধারণা হলে রোযা ভাঙ্গা জায়িয আছে। পরবর্তীতে কাযা করতে হবে। একান্ত কাযা করার শক্তি না পেলে উক্ত রোযার ফিদিয়া দিতে হবে অর্থাৎ, প্রত্যেক রোযার বদলে একজন গরীবকে দু'বেলা খাওয়াতে হবে বা পোনে দু'সের আটা কিংবা তার মূল্য গরীবকে দিতে হবে। (দুররে মুখতার: ২/৪২২)

১৩. নাবালেগ ছেলে-সন্তানদেরকে রোযা রাখার হুকুম করতে হবে, যদি তারা এর শক্তি রাখে এবং এর দ্বারা তাদের কোন ক্ষতি না হয়। আর দশ বৎসর বয়সে রোযা রাখতে শুরু না করলে প্রয়োজনে প্রহার করা যাবে।(দুররে মুখতার: ২/৪০৯)

১৪. রমাযানের দিনের বেলায় কোন ছেলে বা মেয়ে বালেগ হলে বা কোন কাফের মুসলমান হলে কিংবা মুসাফির সফর শেষ করলে বাকী দিন খানা-পিনা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ঋতুবতী মহিলার হুকুম

১. ঋতুবতী কোন মহিলার যদি দিনের বেলায় স্রাব বন্ধ হয়ে যায় তাহলে দিনের বাকী সময় খানাপিনা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে। আর কোন মহিলার রোযা অবস্থায় ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গেলে তার জন্য উপবাস থাকা জায়িয নেই। বরং সে চুপে চুপে খানা-পিনা করবে এবং পরবর্তীতে রোযাগুলির কাযা করবে। (দুররে মুখতার: ২/৪০৮, ইমদাদুল আহকাম: ২/১৩৯)

২. যদি কোন মহিলা ঔষধ সেবন করে ঋতুস্রাব বন্ধ রাখে তাহলে তাকে পুরো মাসই রোযা রাখতে হবে। তবে স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত করার দরুন কাজটি ঠিক হবে না। (ফাতাওয়া রহীমিয়া: ৬/৪০৪)

রোযা ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহ

১. রোযা স্মরণ থাকা অবস্থায় কোন কিছু খাওয়া বা পান করা অথবা স্ত্রী-সহবাস করা। এতে কাযা ও কাফফারা (একাধারে দুই মাস রোযা রাখা) ওয়াজিব হয়। ২. নাকে বা কানে তৈল বা ঔষধ প্রবেশ করানো। ৩. নস্য বা হাপানী রোগীর জন্য ইনহেলার গ্রহণ করা। ৪. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখভরে বমি করা। ৫. বমি আসার পর তা গিলে ফেলা। ৬. কুলী করার সময় পানি গলার ভিতরে চলে যাওয়া। ৭. দাঁতে আটকে থাকা ছোলার সমান বা তার চেয়ে বড় ধরনের খাদ্যকণা গিলে ফেলা। ৮. মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে পড়ে সুবহে সাদিকের পরে জাগ্রত হওয়া। ৯. ধূমপান করা। ১০. ইচ্ছাকৃতভাবে আগরবাতি কিংবা অন্য কোন সুগন্ধি দ্রব্যের ধোঁয়া গলধকরণ করা বা নাকের ভিতরে টেনে নেওয়া। ১১. রাত্র মনে করে

সুবহে সাদিকের পর সাহরী খাওয়া বা পান করা। ১২. সূর্যাস্তের পূর্বে সূর্য অস্তমিত হয়েছে ভেবে ইফতার করা। এগুলোতে শুধু কাযা ওয়াজিব হয়, কাফফারা ওয়াজিব হয় না। কিন্তু রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার পর দিনের বাকী সময় রোযাদারের ন্যায় পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে। (রদ্দুল মুহতার ও দুররে মুখতার: ২/৪০২)

রোযা মাকরুহ হওয়ার কারণসমূহ

১. মিথ্যা কথা বলা। ২. গীবত বা চোগলখোরী করা। ৩. গালাগালি বা ঝগড়া-ফাসাদ করা। ৪. সিনেমা দেখা বা অন্য কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া। ৫. সকাল বেলায় নাপাক অবস্থায় থাকা। ৬. রোযার কারণে অস্থিরতা বা কাতরতা প্রকাশ করা। ৭. কয়লা, মাজন, টুথ পাউডার, টুথপেষ্ট বা গুল দিয়ে দাঁত মাজা। ৮. অনর্থক কোন জিনিস মুখের ভিতরে দিয়ে রাখা। ৯. অহেতুক কোন জিনিষ চিবানো বা চেখে দেখা। ১০. কুলী করার সময় গড় গড়া করা। ১১. নাকের ভিতর পানি টেনে নেয়া। (কিন্তু উক্ত পানি গলায় পৌঁছলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।) ১২. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখে থুথু জমা করে গিলে ফেলা। ১৩. ইচ্ছাকৃতভাবে অল্প বমি করা। (দুররে মুখতার: ২/৪১৬, বাদাইউস সানায়ে: ২/৬৩৫, কিতাবুল ফিকহ: ১/৯২৩)

যে সমস্ত কারণে রোযার ক্ষতি হয় না

১. ভুলক্রমে পানাহার করা। ২. আতর সুগন্ধি ব্যবহার করা বা ফুল ইত্যাদির ঘ্রাণ নেওয়া। ৩. নিজ মুখের থুথু ও কফ জমা না করে গিলে ফেলা। ৪. শরীর বা মাথায় তৈল ব্যবহার করা। ৫. ঠাণ্ডার জন্য গোসল করা। ৬. ঘুমে স্বপ্নদোষ হওয়া। ৭. মিসওয়াক করা। ৮. অনিচ্ছাকৃত বমি হওয়া ৯. চোখে ঔষধ বা সুরমা ব্যবহার করা। ১০ যে কোন ধরনের ইনজেকশন লওয়া। (রদ্দুল মুহতার ও দুররে মুখতার: ২/৩৯৪)

রমাযান মাসে ৪ টা কাজ বেশি বেশি করাঃ

(১) রোযা রেখে নিজেকে দেখা-শুনা করতে হবে, যাতে কোন প্রকার গুনাহ না হয়। গুনাহ ছাড়তে হবে।

(২) রমাযান মাস কুরআন শরীফ নাযিলের মাস, তাই প্রতি দিন কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের জন্য সময় রাখতে হবে। এটা রমাযান মাসের হক।

(৩) কালিমায়ে তাইয়্যিবা বেশী করে পড়তে হবে।

(৪) রমাযান মাসে এই দু'আ বেশি করে পড়তে হবে - اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارَ

শবে ক্বদরের রাত্রিতে নিম্নের দু'আ বেশি বেশি পড়তে থাকা - اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

(আমালুল য়াউমি ওয়াললাইলাহ: হাদীস নং ৭৬৭ ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৮৫০)

খ. তারাবীহ নামাযঃ

তারাবীহ নামায ২০ রাকা'আতঃ

হযরত ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ .এর উস্তাদ আবু বকর ইবনে শাইবা রহ .এর কিতাব আল মুসান্নাফ পৃঃ ২/১৬৬, হাদীস নং ৭৬৯১, এছাড়া হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব বাইহাকী পৃঃ ২/৬৯৮-৬৯৯, হাদীস নং ৪৬১৫, ৪৬১৭, তাবারানী পৃঃ ১১/২৬১, হাদীস নং ৭৭৩৩, "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি .থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসের রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল দ্বারা ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায প্রমাণিত।" (আন-নুকাত আলা মুকাদ্দামাতি ইবনিস সালাহ-১/৩৯০, আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ-১/৪৯৪)

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রাযি .তার খেলাফত আমলে মসজিদে নববীর মধ্যে তারাবীহ নামাযের অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামা'আতকে একত্র করে হযরত উবাই বিন কাআব রাযি .এর ইমামতীতে ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামাযের হুকুম দিয়েছিলেন। সকল সাহাবায়ে কেরাম রাযি . তাঁর সমর্থন করেছিলেন। তারাবীহ নামায যদি নবী আলাইহিস সালাম থেকে ২০ রাকা'আত প্রমাণিত না হতো তাহলে সাহাবায়ে কেরাম রাযি . অবশ্যই আপত্তি তুলতেন । (বাইহাকী পৃঃ ২/৪৯৭, হাদীস নং ৪৬১৭,৪৬২০, ৪৬২১, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক পৃঃ ৪/২৬১, হাদীস নং ৭৭৩২, বুখারী পৃঃ ১/৪৭৪, হাদীস নং ২০১০, মাজামাউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া-২৩/১১২-১১৩ বাদায়েউস সানায়ে-১/৬৪৪)

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গনী রাযি., চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রাযি .সহ সাহাবায়ে কিরামের রাযি .ঐক্যমতে, উম্মাতে মুসলিমার ১৪০০ শত বছর পর্যন্ত ধারাবাহিক আমল তারাবীহ নামায বিশ রাকা'আত চলে আসছে। যা আজ পর্যন্ত বাইতুল্লাহ শরীফ ও মসজিদে নববীতে চালু আছে। (বাইহাকী কুবরা পৃঃ ২/৪৯৬, হাদীস নং ৪৬১৭, পৃঃ ২/৪৯৭, হাদীস নং ৪৬২০, ৪৬২১, শরহুল মুহাজ্জাব পৃঃ ৩/৩৬৩-৩৬৪)

ইমাম আ'জম আবু হানীফা রহ., ইমাম মালেক রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ., ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ .যারা প্রত্যেকে স্বীয় যামানায় সব চেয়ে বড় কুরআন ও হাদীস বিশারদ ও ফকীহ ছিলেন তাদের সকলের মতে তারাবীহ নামায ২০ রাকা'আত, ৮ রাকা'আত নয়। (আলমাবসূত পৃঃ ২/১৯৬, ই'লাউস সুনান পৃঃ ৭/৬৯/৭১, আত্তামহীদ পৃঃ ৩/৫১৮, আলমুদাউওয়ানাতুল কুবরা পৃঃ ১/২৮৭, শরহুস্ সুন্নাহ পৃঃ ২/৫১১, মুগনী পৃঃ ২/৬০৪)

আট রাকা'আত তারাবীহ নামায পড়া রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আমল ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি-.এর ইজমা পরিপন্থী এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলের বিপরীত, অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণের জন্য তাকীদ করে গেছেন।(আবু দাউদ হাদীস নং ৪৬০৭, তিরমিযী হাদীস নং ২৬৭৬, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৪২-৪৩)

আট রাকা'আত নামাযের হাদীসটি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিমসহ অন্যান্য মুহাদ্দেসীনে কিরামের মতে একান্তভাবে তাহাজ্জুদের জন্য প্রযোজ্য। কোন অবস্থায় তা তারাবীহ নামাযের জন্য প্রযোজ্য নয়, এ জন্য তাঁরা এ হাদীসটি তাদের কিতাবে তাহাজ্জুদের অধ্যায় এনেছেন, তারাবীহ অধ্যায়ে তারাবীহ নামাযের রাকা'আতের সংখ্যা প্রমাণের জন্য আনেননি। তাছাড়া উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা রাযি .থেকে বর্ণিত হাদীসটি এমন এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর যার ধারণা ছিল নবী 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে অন্য মাসের তুলনায় তাহাজ্জুদ নামায অনেক বেশি পড়তেন, তার প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানে ও রমাযানের বাইরে অন্যান্য মাসে আট রাকাআতের বেশী তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন না।"

এখানে তিনি এমন নামাযের কথা আলোচনা করেছেন যা রমাযান শরীফে এবং রমাযান ছাড়া অন্য মাসেও পড়া যায়। আর তারাবীহ নামায রমাযান ছাড়া অন্য মাসে পড়া যায় না। কাজেই এ হাদীস দ্বারা কস্মিনকালেও তিনি তারাবীহ নামায ৮ রাকা'আত বুঝাননি। বরং তাহাজ্জুদের নামায ৮ রাকা'আত বুঝিয়েছেন। যা রমাযান ও রমাযানের বাইরেও পড়া যায়।

অত্যন্ত দুঃখজনক যে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য কতক লোক যারা হাদীসের মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ তারা এ হাদীসের দ্বারা তারাবীহ নামায ৮ রাকা'আত প্রমাণ করে, যা নিতান্তই বোকামী।(বুখারী পৃঃ হাদীস নং ১১৪৭, বুখারী হাদীস নং ২০১৩)

তারাবীহ নামায মাত্র ৮ রাকা'আত মনে করে পড়লে তা একাধারে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল খুলাফায়ে রাশেদীন এর আমল এবং সাহাবায়ে কিরাম রাযি .এর ইজমা বা ঐক্যমতের পরিপন্থী হওয়ায় জঘন্য বিদ'আত এবং মনগড়া ইবাদত হবে। যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস অনুযায়ী গোমরাহী এবং জাহান্নামের আমল। এর থেকে বেঁচে থাকা সকল মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। (বুখারী হাদীস নং ২৬৯৭, মুসলিম হাদীস নং ১৭১৮, আবু দাউদ হাদীস নং ৪৬০৬, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ১৪)

তারাবীহ নামাযে বিতর সহ ৪ রাকা'আত পর পর ৫ টি বিরতি।(বাইহাকী হাদীস নং ৪৬২১, হিদায়া পৃঃ১/১৫০, ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া পৃঃ ১/৬৫৪)

তারাবীহা অর্থ বিশ্রাম করা, তার বহুবচন তারাবীহ। শব্দটি বহু বচন হওয়াটা দলীল যে এ নামাযে দু'এর অধিক বিরতি বিশ্রাম হওয়া জরুরী। তারাবীহ ৮ রাকা'আত হলে তা কখনো সম্ভব হবে না।

তারাবীহ সহ সকল প্রকার নামাযে তাজবীদের সাথে তিলাওয়াত করা জরুরী। তাজবীদ বিহীন অস্পষ্ট অতি দ্রুত তিলাওয়াত শরী'আতে নিষেধ।(সূরায়ে মযযাম্মিল ৪ তাফসীরে মাজহারী পৃঃ৯/১০, তালীফাতে রশীদিয়া পৃঃ২৬৯)

•খতমে তারাবীহ নামাযের পারিশ্রমিক দেয়া ও নেয়া উভয়টা নিষিদ্ধ ও গুনাহের কাজ। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদীস নং ৭৭৩৮, ৭৭৪২, ফাতাওয়ায়ে শামী পৃঃ ৫/৫৬, ইমদাদুল মুফতীন পৃঃ ৩১৫, আহসানুল ফতওয়া ৩/৫১২, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৪/২৭৩)

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া থেকে সুন্নাত তরীকায় তারাবীহ পড়ার জন্য হাফেয সাহেব নেয়ার শর্তাবলীঃ

১. হাফেয সাহেব ও তারাবীহ কর্তৃপক্ষ পরিস্কার ভাবে তারাবীহ নামাযের বিনিময় লেন-দেন না করার ব্যাপারে একমত হতে হবে।

২. তারাবীহতে খতমের সময় টাকা-পয়সা বা অন্য কোন প্রকার হাদিয়া, সম্মিলিত কালেকশনের কিংবা মসজিদ ফান্ডের টাকা ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই হাফেয সাহেবকে দেয়া যাবে না, আর হাফেয সাহেবও নিবেন না। কেননা এটা শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়িয ও গুনাহের কাজ।

৩. হাফেয সাহেবকে দ্রুত পড়তে বাধ্য করা যাবে না, কেননা এভাবে কুরআন তিলাওয়াতে গুনাহ হয়। হাফেয সাহেব তারাবীহতে হদর অর্থাৎ, সহীহ শুদ্ধ করে মধ্যম গতিতে পড়বেন। তারাবীহতে লুকমা দেয়া হলে হাফেয সাহেব হা গ্রহণ করবেন, লুকমা গ্রহণে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না।

৪. প্রতি চার রাকা'আতের শেষে 'সুবহানাল্লাহিল মুলকি' পড়া অথবা সম্মিলিত মুনাজাত করা হাদীসে প্রমাণিত নেই, এর জন্য হাফেয সাহেবকে হুকুম করা যাবে না। বরং সে সময় যে কোন দু'আ বা যিকির করা যেতে পারে। তেমনি ভাবে "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাহ" তারাবীহ নামায শেষে গুরুত্ব সহকারে পড়া হয়, অথচ এভাবে পড়াও হাদীসে প্রমাণিত নেই। সুতরাং এর জন্যও হাফেয সাহেবদেরকে হুকুম করা যাবে না।

৫. তারাবীহ নামাযের মাঝে হাফেয ইমাম বদল যে কোন চার রাকা'আতের পরে হওয়া উত্তম। দশ রাকা'আতের মাথায় না করা চাই।

৬. হাফেয সাহেবদের মাধ্যমে তাহাজ্জুদের জামা'আত বা কিয়ামুল লাইল এর জামা'আত) তিন জনের বেশী মুসল্লী দ্বারা (চালু করা যাবে না। কারণ এটা না জায়িয ।

৭. হাফেয সাহেবদের মাধ্যমে প্রতিদিন স্বল্প সময়ের জন্য সুন্নাতের তা'লীম ও নামাযের আমলী মশক্বের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

৮. হাফেয সাহেবদের রমযানের খানার ইন্তেযাম করা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে থাকবে।

৯. প্রতিদিন যাতায়াত করলে তার খরচ এবং তারাবীহ খতম শেষে হাফেয সাহেব নিজ বাড়িতে পৌঁছার খরচ কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে।

১০. খতমের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় কেউ যদি নিজ উদ্যোগে হাফেয সাহেবের মুহাব্বতে ব্যক্তিগত ভাবে হাদিয়া পেশ করেন তাহলে শরিআতে তার অনুমতি আছে এবং এটা আলেম-উলামা ও তালেবে ইলমদের খেদমতের অন্তর্ভুক্ত, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা কুরআনে

কারীমের তৃতীয় পারায় সূরা বাকারায় ২৭৩ নং আয়াতে উৎসাহিত করেছেন। তবে এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার, কেউ করতে চাইলে করতে পারেন।

তারাবীহ এর বিনিময় গ্রহণের শরয়ী বিধান

তারাবীহ এর নামাযে ইমামতের বিনিময় আদান-প্রদান না-জায়িয হওয়া নির্ভরযোগ্য সকল ফিকাহবিদদেরে সর্বসম্মত মত। অতীতের কোন ফক্বীহ এ ব্যাপারে দ্বিমত করেননি। এতদসত্বেও বর্তমানে কেউ কেউ নিজস্ব মতকে শরী'আতের মত ও ফিক্বাহবিদদের মত হিসাবে প্রচার করে তারাবীহ এর উজরতকে বৈধ বলার প্রয়াস চালাচ্ছেন। এ প্রেক্ষিতে সমকালীন বিশিষ্ট মুফতিয়ানে কিরামের ফাতাওয়া নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

ফাতাওয়া বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া, ঢাকা।

ইবাদত বন্দেগী হিসাবে আমরা যা পালন করে থাকি, সাধারণত তা তিন প্রকার (ক) মাকাসিদ তথা খালেস ও মূল ইবাদাতঃ -যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির আযকার ও দু'আ দুরূদ ইত্যাদি (খ) ওয়াসাইল তথা সহায়ক ইবাদাতঃ -যেমন ইমামত, ইকামত, দীনী শিক্ষাদান ও ওয়াজ নসীহত ইত্যাদি।(গ) রুক্বইয়াত তথা বালা মুসীবত থেকে পরিত্রাণ, রোগ মুক্তি, ব্যবসায় উন্নতি এ জাতীয় দুনিয়াবি কোন উদ্দেশ্যে বৈধ দু'আ, খতম, ঝাড় ফুঁক, তাবীয কবয ইত্যাদি।

প্রথম প্রকার তথা মাকাসিদ জাতীয় ইবাদত করে বিনিময় নেয়া-দেয়া সম্পূর্ণ ও সর্বসম্মতভাবে হারাম। এ ব্যাপারে কোন কালেও কোন মাযহাবের কোন নির্ভরযোগ্য আলেম ফক্বীহ দ্বিমত পোষণ করেননি। পক্ষান্তরে তৃতীয় প্রকার আমলের বিনিময় গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হালাল। শুরু থেকে অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কোন মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কোন মুজতাহিদ ফক্বীহ দ্বিমত পোষণ করেননি। (রদ্দুল মুহতার ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫৫,৫৮ পৃষ্ঠা, আল মুদওয়ানাতুল কুবরা ৩য় খন্ডঃ ৪৩১ পৃষ্ঠা, ফাতওয়া রশীদিয়া-৪১৭পৃষ্ঠা।)

আর দ্বিতীয় প্রকার তথা আযান, ইমামত, কুরআন-হাদীস তথা দীনী তা'লীম এ জাতীয় পর্যায়ের ইবাদাতের বিনিময় গ্রহণ ও প্রদান অন্যান্য মাযহাবে জায়িয থাকলেও হানাফী মাযহাবের পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের মতে নাজায়িয। কিন্তু উলামায়ে মুতাআখখিরীন (পরবর্তী যুগের আলেমগণ) শরী'আতের বিশেষ উসূল তথা মূলনীতির ভিত্তিতে বিশেষ কতক ইবাদাতের বিনিময় গ্রহণ ও প্রদানকে বৈধ বলেছেন। সে উসূল হলো এ শ্রেণীর যে সকল ইবাদাত ফরয ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং শি'আরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত অথবা দীনের স্থায়িত্ব তার উপর নির্ভরশীল বিধায় বিনিময়ের আদান-প্রদান বৈধ না হলে এ যুগে এসকল ইবাদত কায়েম রাখা সম্ভব হবে না, তাই দীনের স্থায়িত্বের প্রয়োজনেই তা জায়িয। ফিক্বাহবিদগণ সে সকল ইবাদতকে চিহ্নিতও করেছেন আর তা হলোঃ ফরয ওয়াজিব নামাযের ইমামতি, আযান-ইকামত, দীনি শিক্ষাদান ইত্যাদি। (সূত্রঃ রদ্দুল মুহতার-৬ষ্ঠ খন্ডঃ ৬৯০, ৬৯১ পৃষ্ঠা। ইমদাদুল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড ৪৭৬ পৃষ্ঠা ইমাদদুল মুফতীন ৩১৩ পৃষ্ঠা, ইমদাদুল আহকাম-৩য় খণ্ড ৫২৭ পৃষ্ঠা)

পক্ষান্তরে এ দ্বিতীয় প্রকারের যে সকল ইবাদাত ফরয ওয়াজিব নয় এবং শি'আরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়, দীনের স্থায়িত্বও তার উপর নির্ভরশীল নয় যেমনঃ তারাবীহ এবং সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে কুরআন খতম করা। এ সকল ইবাদাতের বিনিময় গ্রহণ ও বিনিময় প্রদানকে কোন আলেম জায়িয বলেননি বরং নির্ভরযোগ্য সকল ফিক্বাহবিদ লেনদেনকে হারাম বলেছেন। (ফাতওয়া রশীদিয়া ৩২৪পৃঃ, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড ৪৮৪ পৃষ্ঠা, ইমদাদুল মুফতীন ৩১৫ পৃষ্ঠা, ইমদাদুল আহকাম ৩য় খণ্ড ৫১৭ পৃষ্ঠা। আহসানুল ফাতওয়া ৩য় খণ্ড ৫১৪ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৮ম খণ্ড ২৪৭ পৃষ্ঠা, ফাতওয়া দারুল উলুম ৪র্থ খণ্ড ২৭৩ পৃষ্ঠা।)

সম্প্রতি দৈনিক ইনকিলাবের "ইসলামী জীবন পাতায়" একটি প্রশ্নের জবাবে দুজন আলেম তারাবীহের বিনিময়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে একজন আলেম তার বর্ণনার এক পর্যায়ে লিখেছেন "যুগের সকল ইমাম মুজতাহিদ ঐক্যবদ্ধভাবে রায় দিয়েছেন যে পবিত্র কুরআন সুন্নাহর হেফাজত তথা তালীমে ইলমে দীন, ওয়াজ নসীহত, আযান ইকামত এক কথায় যাবতীয় ধর্মীয় আমলগুলোর উপর হাদিয়া বা উজরত যে কোন নামে দেয়া নেয়ায় কোন দোষ নেই বরং উচিত।" এ উক্তির শেষ বাক্যে তিনি ইবাদাতের সব শ্রেণীকে একাকার করে ফেলেছেন। যার মর্ম দাঁড়ায় যে অন্যের জন্য নামায পড়ে, রোযা রেখে বিনিময় গ্রহণ করা যাবে বলে যুগের সকল ইমাম মুজতাহিদ ও আলেম ঐক্যবদ্ধ রায় দিয়েছেন। এমন কথা কোন মূর্খ বা দীনের ব্যাপারে স্পষ্ট খেয়ানতকারী ছাড়া বলতে পারে না। তিনি প্রমাণ করতে গিয়ে যে সকল কিতাবের বরাত দিয়েছেন, সেগুলোতে এ জাতীয় ফতোয়ার কোন উল্লেখ নেই। আর তারাবীহের বিনিময় আদান-প্রদান বৈধতার কথা থাকার তো প্রশ্নই আসেনা। আর অপর আলেম পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান ইমামতের উপর কিয়াস করে তারাবীহের ইমামতকেও জরুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এর বিনিময়কে জায়িয বলেছেন। অথচ তারাবীহের নামায একদিকে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ অপরদিকে জামা'আত সহকারে খতম তারাবীহের পরিবর্তে সূরা তারাবীহ পড়ার অবকাশও রয়েছে। (রদ্দুল মুহতার ২য় খন্ডঃ ৪৫পৃঃ রদ্দুল মুহতার ২য় খণ্ড ৪৭ পৃঃ)

পক্ষান্তরে পাঁচ ওয়াক্তের জামা'আত মুসাফির ও মাযূর লোক ছাড়া সকল সাবালক পুরুষের জন্য বিশেষ ওযর না থাকলে মসজিদে গিয়ে আদায় করা ওয়াজিব। তাহলে উভয়টা এক রকম কি করে হলো? এ ছাড়া হাফেযগণ নিজ নিজ হিফয ঠিক রাখার তাগিদেই তারাবীহ পড়ানোর সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এমতাবস্থায় বিনিময় না দিলে হাফেয পাওয়া যাবে না, বা খুব কম পাওয়া যাবে এ ধারনা তাঁর মধ্যে কি করে জন্ম হলো? তদুপুরি জনাব মুফতি সাহেব তারাবীর বিনিময় বৈধতায় নিজ মত উল্লেখ করার পর এ ব্যাপারে উলামায়ে মুতাআখখিরীনদের ফাতাওয়া নিম্নরূপ বলে যে বরাত দিয়েছেন তাতে সকলেই সর্বসম্মতভাবে এর বিনিময় লেন-দেনকে সম্পূর্ণ হারাম বলেছেন। তাঁরা পরিস্কার

ভাবে বলেছেন তারাবীহের নামায সুন্নাত আর এর বিনিময় লেন-দেন হারাম। তাই সুন্নাত কায়েমের জন্য হারাম কাজের অনুমতি নেই। (ইমদাদুল ফাতওয়া ১ম খণ্ড ৪৮৪ পৃষ্ঠা ইমদাদুল মুফতীন ৩১৫ পৃষ্ঠা)

আর তৎপূর্ববর্তীগণ সম্ভবত তারাবীহ এর বিনিময় নেয়ার কল্পনা করেননি। যার কারণে তাদের কিতাবাদীতে এতদসংক্রান্ত কোন আলোচনাই পাওয়া যায় না। তাছাড়া আলোচ্য মুফতী সাহেব তাঁর বর্ণনায় এক পর্যায়ে লিখেছেন, 'তারাবীহের নামাযের ইমামতি অন্য নামাযের ইমামতি হতে পৃথক নহে।' (হেদায়া প্রথম খণ্ড ৭৮ পৃষ্ঠা)

এটা পত্রিকার ছাপার ভুল না হয়ে থাকলে ইলমী বিষয়ে চরম খেয়ানত বিবেচিত হবে। কেননা হেদায়া গ্রন্থের কোথাও তারাবীহের জামা'আতের ইমামতীকে অন্য নামাযের ইমামতীর ন্যায় বলা হয়নি, এটা নিছক মুফতী সাহেবের নিজস্ব উক্তি, যার রেফারেন্স কোন ফাতাওয়ার কিতাবে নেই।

সারকথা, ঢালাওভাবে সকল ধর্মীয় আমলের বিনিময় আদান-প্রদানের কথা যেমন ঠিক নয়, তেমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান-ইমামত যেমন জরুরত, তারাবীহের ইমামত ঠিক সে রকম জরুরত সে কথাও কোথাও নেই। বরং আকাবির সাহাবাগণ তো তারাবীহ নামায নিজ নিজ বাড়িতে পড়তেন। এ কারণে বর্তমান ও নিকট অতীতের সকল নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়া অনুযায়ী তারাবীহ-এর ইমামতী করে বিনিময় দেয়া ও নেয়া বৈধ নয়। আর হাদিয়ার সাথে তারাবীহ এর ইমামতের কোন সম্পৃক্ত নেই। কাজেই হাদিয়ার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। খতমের সময় ব্যতীত অন্য সময় যদি হাফেজ সাহেবের মুহাব্বতে ব্যক্তিগতভাবে কেউ হাদিয়া পেশ করেন তাহলে এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ এবং তা শরী'আতেও অনুমোদিত। (ফাতাওয়া রশীদিয়া ৩২৫ পৃষ্ঠা, ইমদাদুল মুফতীন ৩১৪ পৃষ্ঠা, ফাইজুল বারী ৩য় খন্ডঃ ১৮১ পৃষ্ঠা)

সুতরাং হাফেজদের নিজেদের হারাম রিযিক থেকে পরহেজ করা ফরয এবং মুসল্লীদেরও উচিত ক্বারী, হাফেজ আলেমদেরকে সহীহ পন্থায় হাদিয়া পেশ করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

গ. শরী'আতের দৃষ্টিতে শবে ক্বদর

শবে ক্বদর এমন একটি মহা পূণ্যময় রজনী যা আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহে একমাত্র উম্মতে মুহাম্মাদীকে প্রদান করেছেন। অন্য কোন উম্মত উক্ত পবিত্র রজনী পায়নি।

শবে ক্বদরের ফযীলত

১.উক্ত রজনীর অধিক গুরুত্ব, মর্যাদা ও ফযীলত বুঝানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কুরআনে কারীমে স্বতন্ত্র একটি সূরা অবতীর্ণ করেছেন। যার নাম সূরাতুল ক্বদর।

২.শবে ক্বদরে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কারীম লাউহে মাহফূয থেকে প্রথম আকাশ অবতীর্ণ করেন।(সূরাতুল ক্বদর: ১)

৩.শবে ক্বদরের এক রাত্রির ইবাদাত তিরাশি বছর চার মাসের ইবাদতের চেয়েও অধিক উত্তম। (সূরাতুল ক্বদর:৩)

৪.হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় লাইলাতুল ক্বদর ইবাদতের মাধ্যমে কাটাবে আল্লাহ তা'আলা তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ মাফ কবে দিবেন। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ১৯০১, মুসলিম শরীফ হাদীস নং ১৭৫)

৫.এই রাত্রে আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের একটি জামা'আত নিয়ে পৃথিবীতে শুভাগমন করেন এবং আল্লাহ তা'আলার ইবাদতগুযার বান্দাদেরকে সালাম ও রহমতের দু'আ করতে থাকেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর:৮/৪১৪)

ক্বদরের রাত কোনটি

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন, আমি কুরআনে কারীমকে ক্বদরের রাত্রে অবতীর্ণ করেছি। (সূরাতুল ক্বদর: ১)

অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ রমাযান মাসে কুরআনে কারীমকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। (বাকারা:১৮৫)

উক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, শবে ক্বদর রমাযান মাসেই সংঘটিত হয়।

আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমরা রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রগুলোতে লাইলাতুল ক্বদর তালাশ কর। (বুখারী শরীফ: হাঃ নং ২০১৭, মুসলিম শরীফ হাঃ নং ১১৬৯)

যির ইবনে হুবাইশ রহ. বর্ণনা করেন, আমি হযরত উবাই ইবনে কা'আব রা. কে লাইলাতুল ক্বদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম এবং বললাম আপনার ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলে থাকেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ এক বৎসর জাগ্রত থাকবে সে লাইলাতুল ক্বদর পাবেই। উত্তরে হযরত উবাই ইবনে কা'আব রা. বলেনঃ আল্লাহ তার উপর রহম করুণ তিনি ইচ্ছা করেছেন লোকেরা যেন এক রাতের উপর ভরসা করে বসে না থাকে। নিশ্চয় তিনি জানেন তা রমাযানে এবং তাও জানেন যে তা রমাযানের শেষ দশকে এবং ২৭ তারিখে। অতঃপর হযরত উবাই ইবনে কা'আব রা. শপথ করে বললেনঃ অবশ্যই তা ২৭ তারিখের রজনীতেই হয়ে থাকে। যির ইবনে হুবাইশ বলেনঃ আমি বললামঃ হে আবুল

মুনযির! (উবাই ইবনে কা'আব এর উপ নাম) এটা কিসের ভিত্তিতে বলছেন? তদুত্তরে তিনি বললেনঃ আলামত বা নিদর্শনের ভিত্তিতে যা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলে দিয়েছেন; সে দিন সূর্যের কিরণ থাকে না। (মুসলিম শরীফ হাঃ নং ৭৬২)

শবে ক্বদর হাসিল করার উপায়

ক. রমাযানের শেষের দশকে ই'তিকাফ করা অর্থাৎ, ২০শে রমাযান সূর্য ডোবার পূর্ব হতে ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করা। পেশাব পায়খানা বা ফরয গোসলের প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের না হওয়া।

খ.এটা সম্ভব না হলে অন্তত শেষ দশকের শুধু রাত গুলোতে মসজিদে নফল ই'তিকাফ করা। দিনে দুনিয়াবী জরুরত পূর্ণ করা।

গ.এটাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে শেষ দশকের ইশা ও ফজরের নামায গুরুত্ব সহকারে জামা'আতের সাথে আদায় করা। এবং বেজোড় রাতগুলোতে নফল নামায, তিলাওয়াত ইত্যাদি তুলনামূলকভাবে বেশী করা।

শবে ক্বদরে করণীয় কাজসমূহ

১.এ পূণ্যময় রজনীতে অবহেলা না করে গুরুত্ব ও ইখলাসের সাথে ইবাদত বন্দেগীতে লেগে থাকা চাই। চাই নফল নামায বা তিলাওয়াত যিকির আযকারে হোক কিংবা দু'আয় মশগুল থাকার মাধ্যমে হোক।

২.নিজের জীবনের পাপরাশির কথা স্মরণ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট কাকুতি মিনতি ও রোনাজারীর সাথে তাওবা করা ও ক্ষমা চাওয়া। (সূরা নূহ: ১০)

৩.ইখলাসের সাথে সাওয়াবের আশায় উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে নেক আমলে লিপ্ত থাকা। (বুখারী: হাঃ নং ১৯০১, মুসনাদ আহমাদ: হাঃ নং ১৭১৪৫)

৪.এ রাত্রিতে বেশী বেশী নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তে থাকা- اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ (আমালুল য়াউমি ওয়াললাইলাহ: হাঃ নং ৭৬৭ ইবনে মাজাহ: নং ৩৮৫০)

৫. উক্ত রাত্রির কিছু অংশ কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতে নিমগ্ন থাকা। কিছু অংশে নফল নামায বিশেষ করে সালাতুত তাসবীহ আদায় করা। আর কিছু অংশে যিকির আযকার দু'আ মুনাজাত করা। (সূরা আনকাবূত:৪৫)

শবে ক্বদরে বর্জনীয় কাজসমূহ

১.মসজিদে নিঃপ্রয়োজনে মোমবাতি জ্বালানো ও আলোক-সজ্জা করা। কারণ এটা অপব্যয়। আর অপব্যয় করা নাজায়িয। (সূরায়ে আ'রাফ: ৩১, বনী ইসরাঈল:২৭)

২.জামা'আতের সাথে সালাতুল তাসবীহ, তাহাজ্জুদ কিংবা অন্য কোন নফল নামায পড়া। কারণ নফল নামায জামা'আতের সাথে নাজায়িয। (রদ্দুল মুহতার: ১/৫৫২)

৩.ঘোষণা করে মসজিদে সম্মিলিত দু'আর আয়োজন করা। হ্যাঁ ! ঘোষণা বা ডাকাডাকি ছাড়া এমনিতে যারা উপস্থিত ছিল তারা দু'আ করে নিলে তা জায়িয।

৪.এই রাতে মসজিদে প্রচলিত মীলাদ-ক্বিয়াম করা। কারণ ইহা সুস্পষ্ট বিদ'আত। (মুসনাদে আহমাদ: হাঃ নং ১৭১৪৯)

৫. এত অধিক রাত্র পর্যন্ত জাগ্রত থাকা, যাতে ঘুমের তাড়নায় ফজরের জামা'আত ছুটে যায় কিংবা কাযা-ই হয়ে যায় বা এমন হয়ে যায় যে নামাযে কি সূরা কালাম পড়ছে তা নিজেরও খবর নেই। (মুআত্তা ইমাম মালেক: হাঃ নং ১৫৫, আল ইসাবা: ৩/২০০)

বি:দ্র: মসজিদে ইমাম ও খতীবগণের কর্তব্য ঐদিন লম্বা সময় ওয়াজ ও বয়ানে না কাটানো। বরং তার আগে জুমু'আয় বা কোন একদিন শবে ক্বদরের আহকাম বলে দেয়া। একান্ত ঐ দিনই কথা বলার প্রয়োজন হলে সংক্ষেপে এই রাত্রের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে কিছু কথা বলে মুসল্লীদেরকে উৎসাহ দিয়ে ইবাদতের প্রতি নিবিষ্ট করার চেষ্টা করবে। তবে সর্বাবস্থায় জ্বাল হাদীস ও ভিত্তিহীন ঘটনাবলী বর্ণনা থেকে বিরত থাকা চাই। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম: হাঃ নং ৭)

পটকাবাজী, আতশবাজী ইত্যাদি কুসংস্কার থেকে বিরত থাকা। বিশেষ করে অভিভাবকদের কর্তব্য হলো ছোটদেরকে উক্ত ব্যাপারে সাবধান করে দেয়া এবং তাদের হাতে টাকা পয়সা না দেয়া। কারণ এই অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে নিজেকে যেমন উক্ত রাতে অনেক ফযীলতপূর্ণ ইবাদত থেকে বঞ্চিত রাখা হয়, ঠিক তেমনই উক্ত জিনিসগুলোর বিকট ও ভয়ংকর শব্দের দরুন আল্লাহর বান্দাদেরকে আতংকের মধ্যে ফেলে কষ্ট দেয়া হয়। তাই উক্ত শরীয়ত পরিপন্থী জঘন্য কাজে লিপ্ত হওয়া কবীরা গুনাহ ও হারাম।(সূরা বাকারা: ১১৪, বনী ইসরাঈল: ২৭)

এই রাত্রকে উপলক্ষ করে অধিক ও উত্তম খানা ও তাবারকের আয়োজন থেকে বিরত থাকা। মসজিদে শিরনী, মিষ্টি ইত্যাদির আয়োজন থেকে বেঁচে থাকা।

ঘ.যাকাতের গুরুত্ব, ফযীলত ও জরুরী মাসাইল

যাকাতের আভিধানিক অর্থ

যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পবিত্র করা, বৃদ্ধি পাওয়া (বস্তুত যাকাত দিলে মাল পবিত্র হয় এবং বৃদ্ধি পায়।)

পারিভাষিক অর্থ

কোন অসচ্ছল গরীব মুসলমানকে বা মুসলমানদেরকে কোন প্রকার বিনিময় ও শর্ত ছাড়া যে সকল মালের উপর যাকাত প্রযোজ্য ঐ মালের (বর্তমান বাজারের বিক্রয় মূল্যের) চল্লিশ ভাগের এক অংশের মালিক বানানো। (আদ্দুরুল মুখতার ২:২৫৬)

যাকাত আদায়ের হুকুম ও তরককারীর পরিণতি

যাকাত ইসলামের একটি অন্যতম রুকন, নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্দিষ্ট সম্পদের মালিকের জন্য যাকাত আদায় করা ফরয। যাকাত অস্বীকার করলে ঈমান চলে যায়। যাকাতের ফরযিয়্যাত স্বীকার করে আদায় না করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

যারা যাকাত আদায় করবে না তাদের সম্পর্কে কুরআন হাদীসে অনেক কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরা তাওবায় আল্লাহ তা'আলা বলেন (তরজমা) "যারা স্বর্ণ রূপা (ধন-সম্পদ) জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে খরচ করে না (অর্থাৎ, যাকাত দেয় না) তাদেরকে কঠোর শাস্তির সংবাদ দিন। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তাদের সম্পদ উত্তপ্ত করা হবে এবং সে গুলোর দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে।"

সেদিন বলা হবে এগুলো সেই সম্পদ যার যাকাত না দিয়ে তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন তার স্বাদ আস্বাদন কর। (সূরা তাওবা-৩৪/৩৫)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে না কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার গলায় সেই মালকে সাপ বানিয়ে ঝুলিয়ে দিবেন। অন্য এক হাদীসে আছে যে, সাপ তার দুই চোয়ালে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চয়। (তিরমিযী হাঃ নং ২৪৪১, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ১৭৮৪)

এছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে আরো অনেক শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে।

যাকাত যোগ্য সম্পদ ও যাকাতের নিসাব

ঋণ ও মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য, অথবা ৫২.৫ তোলার রূপার মূল্য সমপরিমাণ নগদ টাকা বা ব্যবসায়ের মালের মালিক হলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হয়। (আলমগীরী ১:১৮৭-১৯২)

উল্লেখ্য যে, কোন প্রকার সম্পদ স্বতন্ত্রভাবে নেসাব পরিমাণ না হয়ে একাধিক প্রকারের অল্প অল্প হয়ে সমষ্টিগতভাবে মূল্য হিসাবে ৫২.৫ তোলার মূল্য সমপরিমাণ হলেও যাকাত প্রযোজ্য হবে। (আল বাহরুল রায়েক ২:৪০০,৪০১)

যাকাত যার উপর ফরয হয়

সাবালক সজ্ঞান মুসলমান নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর চন্দ্র মাস হিসেবে এক বছর অতিবাহিত হলে তার উপর যাকাত আদায় করা ফরয হয়।

একই পরিবারে একাধিক ব্যক্তি (যেমন, স্বামী, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে) নেসাবের মালিক হলে প্রত্যেককেই স্বতন্ত্রভাবে যাকাত আদায় করতে হবে। নেসাবের মালিক প্রত্যেকের উপরই যাকাত আদায় করা ফরয। স্ত্রীর যাকাত স্বামীর উপর বর্তায় না, তেমনিভাবে সন্তানদের যাকাত পিতার উপর বর্তায় না। তবে কেউ যদি অন্যের অনুমতিক্রমে তার পক্ষ থেকে যাকাত দিয়ে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

যাকাত কাকে দিবেন?

যাদের সাথে দাতার জন্মগত সম্পর্ক আছে যেমনঃ তার পিতা মাতা, দাদা, দাদী, নানা, নানী, প্রমুখ এবং দাতার সাথে যাদের জন্মগত সম্পর্ক আছে যেমনঃ তার ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনী ইত্যাদি তাদেরকে যাকাত ফিতরা দেওয়া যায় না।

অনুরূপ ভাবে স্বামী তার স্ত্রীকে, স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত ফিতরা দিতে পারবে না। অমুসলিম ও ধনী ব্যক্তি (নেসাব পরিমাণ মালের মালিক) কিংবা ধনীর নাবালেগ সন্তানকে দান করলেও যাকাত ফিতরা আদায় হবে না। বরং যাকাত ফিতরা দিতে হবে এমন গরীব ও ফকীর মিসকীনকে যাদের নিকট নিসাব পরিমাণ মাল নেই।

ধর্মীয় খিদমতে রত নিঃস্ব দরিদ্র ব্যক্তিবর্গকে যাকাত ফিতরা দান করলে ধর্মীয় খিদমতের সহযোগিতা হিসেবে অধিক সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। (সূরা বাকারাঃ ২৭৩)

যাকাত কখন আদায় করতে হয়?

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় যদি রমাযান মাস না হয়ে অন্য কোন মাস হয় তাহলে সে মাসেই যথা তারিখে সমুদয় মালের হিসাব নিকাশ করে যাকাতের পরিমাণ বের করা জরুরী। আদায়ের ক্ষেত্রেও রমাযানের অপেক্ষা না করে সাথে সাথে আদায় করে দেওয়া জরুরী। যাতে রমাযানের পূর্বে ইন্তেকাল হয়ে গেলে ফরয জিম্মায় বাকী না থেকে যায়। দেরি করে আদায় করলে যদিও যাকাত আদায় হয়ে যায়। কিন্তু

ওয়াজিব তরক করার দরুন গুনাহগার হতে হয়। তবে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই যদি যাকাত আদায় করে দেয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (কিফায়াতুল মুফতী ৪:২৬২, আলমগীরী ১:১৮৭-১৯২)

যাকাত সংক্রান্ত কিছু মাসায়েল

১। শুধু স্বর্ণ বা রৌপ্য থাকলে তার যাকাত আদয়ের পদ্ধতি

কোন ব্যক্তি যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মালিক হয় চাই তা ব্যবহার করুক বা নাই করুক ঋণ মুক্ত অবস্থায় তার নিকট এক বৎসর কাল থাকলে তার উপর যাকাত দেওয়া ফরয। যদি তার নিকট অন্য কোন মাল না থাকে তাহলে উক্ত মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ কিংবা তার সমপরিমাণ মূল্য আদায় করতে হবে। প্রয়োজনে উক্ত স্বর্ণ বা রূপা থেকে কিছু অংশ বিক্রি করে হলেও যাকাত আদায় করা জরুরী। (আদদুররুল মুখতার ২:২৯৫)

২। যদি ব্যাংকে বা অন্য কোন তহবিলে কারো টাকা জমা থাকে আর ঐ টাকাগুলো ঋণমুক্ত অবস্থায় নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে চন্দ্র মাস হিসেবে এক বছর অতিক্রান্ত হলে তার যাকাত দিতে হবে। (আলমগীরী ১:৭২, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৩:৫৭)

৩। দোকান/বাড়ী ভাড়ার জন্য প্রদত্ত এডভান্স টাকায় যাকাত

যদি কোন সাহিবে নিসাব ব্যক্তি দোকান কিংবা বাড়ী ভাড়া নেয় আর মালিকের নিকট সিকিউরিটি হিসাবে জমা রাখে যা পরবর্তীতে ফেরতযোগ্য তাহলে উক্ত টাকার যাকাত দেয়া ফরয। কারণ, উক্ত টাকা তার মালিকানায়ই রয়েছে । জমা রাখার দরুন তার মালিকানা শেষ হয়নি, সুতরাং অন্যান্য মালের সাথে হিসাব করে তার এ টাকার যাকাতও আদায় করতে হবে। (আদদুররুল মুখতার ২:৩০৫, দারুল উলূম ৬:৭৭ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৫১)

তবে উক্ত টাকা যদি এডভান্স ভাড়া হয় যা থেকে মাসে মাসে কিছু কিছু কাটা যায় তাহলে উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে না।

৪। টাকা ও স্বর্ণ রূপা মিলে নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাতের হুকুম

স্বর্ণ বা রূপার মধ্যে যে কোন একটির গহনা আছে, কিন্তু নিসাব পরিমাণ নয়, কিন্তু তাহার সাথে নগদ টাকা (চাই পাঁচ/দশ টাকাই হোক না কেন) সারা বৎসর হাতে আছে। যদি উক্ত স্বর্ণ বা রূপার সাথে টাকা একত্র করলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার দামের সমান হয় তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। (রদ্দুল মুহতার ২:২৯৬, ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৬:৫০)

৫। করয দেয়া টাকার উপর যাকাত

করয দেয়া টাকা উসূল হওয়ার পর উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে এবং বিগত বছর সমূহে উক্ত টাকার যাকাত না দিয়ে থাকলে সেই বকেয়া যাকাতও দিতে হবে। তবে কেউ যদি করযের টাকা উসূল হওয়ার পূর্বে প্রতি বছর উক্ত টাকার যাকাত দিয়ে দেয়, তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (আদ্দুররুল মুখতার ২:২৬৬, দারুল উলূম ৬:৪৫,৭৭)

যে করযের টাকা পাওয়ার কোন আশা নেই সে টাকার যাকাত দিতে হবে না। আর যদি কখনো উসূল হয় তাহলে সে বছর থেকে যাকাত দিবে। অতীতের যাকাত দিতে হবে না। (কিতাবুল ফিকহ ১:৫৪৮, দূররে মুখতার ও রদ্দুলমুহতার খণ্ড-২ পৃ-২৬৬)

৬। যাকাতের নিয়তে ঋণ মাফ করে দেওয়া

যাকাতের নিয়্যতে ঋণ মাফ করে দিলে যাকাত আদায় হবে না। যাকাত আদায় হওয়ার জন্য তামলীক তথা অন্যকে খালেছ ভাবে যাকাতের মালের মালিক বানিয়ে দেওয়া শর্ত। আর যাকাতের নিয়্যতে ঋণ মাফ করে দিলে গরীবকে যাকাতের টাকার মালিক বানানো হচ্ছে না । তাই এ পদ্ধতিতে যাকাত আদায় হবে না।

তবে এরূপ ক্ষেত্রে যাকাত আদায়ের সঠিক পন্থা হলো, ঋণ দাতা প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে গরীব ঋণ গ্রহীতাকে নিঃশর্তভাবে যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দিবে। তারপর তার থেকে পাওনা ঋণের টাকা উসূল কবে নিবে, এতে যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং ঋণও উসূল হয়ে যাবে। (আদদুররুল মুখতার ২:২৭০, ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১৭১, রহীমিয়া ২:১২)

৭। রাজনৈতিক দলকে যাকাত দেওয়ার বিধান

যদি কোন রাজনৈতিক দল যাকাতের টাকা কুরবানীর চামড়া ইত্যাদি সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় চিকিৎসা সেবার নামে সংগ্রহ করে আর সেগুলোকে ইলেকশনে ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও ব্যয় করে এবং রাজনৈতিক কর্মীদের ভাতা হিসেবে প্রদান করে তাহলে তাদেরকে এ জাতীয় সদকা (অর্থাৎ, সদকায়ে ওয়াজিবাহ) প্রদান করা জায়িয নয়। এবং এতে যাকাত দাতার যাকাত আদায় হবে না। (খাইরুল ফাতাওয়া ৩:৩৯৭)

৮। মসজিদ মাদরাসার কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করা

মসজিদ, মাদরাসা, এতীমখানা, হাসপাতাল ইত্যাদির নির্মাণ কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করলে যাকাত আদায় হবে না। যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত হলো, যাকাতের প্রকৃত হকদারকে বিনিময়হীন ভাবে উক্ত মালের মালিক বানিয়ে দেয়া। নির্মাণ কাজে ব্যয় করলে যেহেতু কোন হকদার ব্যক্তিকে মালিক বানানো হয় না তাই এ সুরতে যাকাত আদায় হবে না। সুতরাং এসব নির্মাণ কাজে কেউ যাকাত দিয়ে থাকলে ঐ পরিমাণ টাকার যাকাত দ্বিতীয়বার আদায় করতে হবে। উল্লেখিত কারণেই যাকাতের মাল জনকল্যাণমূলক কাজে যেমন, রাস্তাঘাট,

কালভার্ট, ইত্যাদির জন্য ব্যয় করা না জায়িয। অনুরূপভাবে ইসলামের নামে টিভি চ্যানেল বা পত্র-পত্রিকার কাজে যাকাত দিলে সে যাকাত আদায় হবে না। (আলমগীরী ১:১৮৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৮২)

৯। হিসাব করে যাকাত দেয়া জরুরী

বহু লোক যাকাত-ই দেয় না। আর কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা যাকাত দেয় ঠিক কিন্তু যাকাত দেয়ার সঠিক পদ্ধতি তারা অবলম্বন করে না।

শরী'আতে যখন শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে বলা হয়েছে তখন উহার দাবী হলো যাকাতযোগ্য সমস্ত সম্পদ হতে হিসাব করে শতকরা আড়াই ভাগ বের করে যাকাত দেয়া। যদি কেউ হিসাব না করে যাকাত আদায় করে আর এই টাকাও নির্দিষ্ট পরিমাণ হতে কম আদায় করে তাহলে তার জন্যও আখিরাতে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। (সূরা তাওবা ৩৪/৩৫)

হিসাব করার সময় যাকাতযোগ্য মালের বর্তমান বাজার দর হিসেবে হিসেব বের করবে। যে দামে খরিদ করা হয়েছে বা ভবিষ্যতে যে দামে বেচা যাবে তা ধর্তব্য নয়। (ফাতাওয়ায়ে শামী ২:২৮৬)

উল্লেখ্য যে, গরীব আত্মীয়-স্বজনকেও যাকাতের মাল দেয়া যায় বরং তাদেরকেই আগে দেওয়া উচিত। অবশ্য তাদেরকে হাদিয়া বলে দেয়া ভালো যাতে তারা মনে কষ্ট না পায়। তবে মেহমানে রাসূল তালিবে ইলমের কথা ভুলে গেলে চলবে না। তাদেরকে যাকাতের বড় অংশ দেয়া উচিৎ তাতে যাকাত তো আদায় হবেই সেই সাথে কুরআনী তা'লীমের সহযোগিতা করার দরুন ছদকায়ে জারিয়ার সাওয়াবও হাসিল হবে। (সূরায়ে বাকারা ২৭৩)

ঙ. ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার শর'ই নীতিমালা

শরী'আতের বিধান মতে চাঁদের উদয়স্থল মেঘলা থাকলে রমাযানের এবং অন্যান্য মাসের জন্য মাত্র ১ জন আর ঈদুল ফিতরের জন্য মাত্র ২ জন বালেগ মুসলমানের স্বচক্ষে চাঁদ দেখার বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আর চাঁদের উদয়স্থল সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকলে সব মাসে জম্মেগাফীর তথা এমন সংখ্যক লোকের চাঁদ দেখা জরুরী যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দাতা আশ্বস্ত হতে পারেন যে, এতগুলো লোক মিথ্যার উপর একমত হতে পারে না। এদের সংখ্যা নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী নির্দিষ্ট নয় এ পরিমাণ হতে হবে যে, সিদ্ধান্ত দাতা সম্পূর্ণ আস্থাশীল হতে পারেন।

সংশয় নিরসন

ক. কেউ কেউ মনে করেন, চাঁদের ফয়সালা দিতে হলে কাজী হওয়া জরুরী। বর্তমান সরকারী হেলাল কমিটি হল কাজীর হুকুমে। কাজেই অন্য কেউ এ ঘোষণা দেয়ার অধিকার রাখেন না। তাদের এ দাবী ভিত্তিহীন। এ ব্যাপারে শর'ই ফতওয়া হল, ইসলামী হুকুমতের অবর্তমানে ঈদ জুম'আ এজাতীয় মাসায়েলের ক্ষেত্রে দেশের প্রখ্যাত ও বিশ্বস্ত সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম উলামাদের পঞ্চায়েতই কাজীর স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্ত হবেন। সুতরাং তারা শর'ই নীতিমালার ভিত্তিতে রমাযান ও ঈদের ফয়সালা দিতে পারবেন, যা ঐ দেশের সকলের জন্য (যদি তাদের নিকট সে সংবাদ পৌঁছে যায়) মান্য করা জরুরী। (আহসানুল ফাতাওয়া ৪র্থ খণ্ড ৪৫৬পৃষ্ঠা, রুইয়াদে হেলাল পৃ. ৬০/৬১, ইসলাম আওর জাদীদ দাওর কে মাসাইল ১২৬/১২৭ পৃষ্ঠা)

খ. আবার কেউ কেউ প্রশ্ন করেন যে, সরকারী চাঁদ দেখা কমিটিতেও তো আলেম আছেন। অপর দিকে বেসরকারী উলামা মাশাইখগণ তার বিপরীত সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন-এখন আমরা কোন আলেমদের সিদ্ধান্তের উপর আমল করব। এর উত্তর হলো- যারা সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিবেন তাদেরটা মান্য করা জরুরী, আর যারা বলবে আমাদের নিকট কোন প্রমাণ আসেনি, বা পাইনি তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ যোগ্য নয়। (বুখারী শরীফ ১: ৩৬০, বাবু ইযা শাহিদা শাহিদুন, কাওয়ায়ে ফী উলুমিল হাদীস, পৃষ্ঠা ২৯০)

যেমন মক্কা বিজয়ের সময় হযরত মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা শরীফের মধ্যে নামায পড়ে ছিলেন কিনা এ বিষয়ে সাহাবাদের রাযি. থেকে দু ধরনের বর্ণনা আছে। পড়ার এবং না পড়ার। কিন্তু রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ার পক্ষে যারা প্রমাণ দিয়েছেন সমস্ত উলামাগণ তাদের কথা গ্রহণ করেছেন।আর যারা নামায পড়েননি বলেছেন তাদের কথা কেউ গ্রহণ করেননি। বরং তাদের ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে তাঁরা যেহেতু ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন না এবং তাঁরা নামায পড়তে দেখেননি, তাই তারা নিজের ইলম অনুযায়ী বলছেনে, যা দলীল প্রমাণের বিপরীত হওয়ায় গ্রহণ যোগ্য নয়।(ফাতহুলবারী,৫৯৭-৮ পৃষ্ঠা, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ১৬০১, উমদাতুলকারী,৩৭০ পৃষ্ঠা, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং-৩৯৭)

(গ) অনেকে প্রশ্ন করেন জাম্মেগাফীর হতে হলে ৫০ জন লোক হতে হবে এবং তাদের সকলের একই এলাকা হতে হবে। এর উত্তর হলো যে নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং এক এলাকা থেকে হতে হবে এরও কোন দলীল নেই বরং জাম্মেগাফীর এর মূল কথা হল যে, বিভিন্ন এলাকা হতে এ পরিমাণ লোক বর্ণনা দিতে হবে যে, চাঁদ দেখার ব্যাপারে সিদ্ধান্তদাতা পুরাপুরি আশ্বস্ত হয়ে যায়। (মুফতি শফী রহ. সংকলিত রুইয়াতে হেলাল, ৬৪ পৃষ্ঠা)

মজার ব্যাপার হল, এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে আরেকটি বর্ণনা আছে যে, বর্তমান যমানায় জাম্মেগাফীর থেকে দুজন বিশ্বস্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত দেয়া বেশী যুক্তিযুক্ত এবং এর দ্বারাও উদয়স্থল পরিস্কার থাকার ক্ষেত্রে রোযা ও ঈদ প্রমাণিত হবে। এর কারণ বলা হয়েছে যে, চাঁদ তালাশ করার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে চরম অনীহা রয়েছে। অপর দিকে কেউ চাঁদ দেখার খবর দিলে তার উপর নানা

রকম হয়রানী ও অত্যাচার করা হয়। যে কারণে যারা চাঁদ দেখে তারাও বলতে সাহস করে না। এমতাবস্থায় জাম্মেগাফীর তথা অনেক লোকের দেখার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে, অনেক লোক জোগাড় করতে করতে রোযা বা ঈদ দু তিন দিন পরে করতে হবে, যা শরী'আতে কোন অবস্থায় কাম্য নয়। (দেখুন ফাতাওয়া শামী, ২য় খণ্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)

চাঁদ দেখা কমিটি কেমন হওয়া উচিত

(ক) বর্তমান বাংলাদেশের চাঁদ দেখা কমিটিতে কিছু আলেম থাকলেও কোন বিজ্ঞ মুফতী (যিনি কোন নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়া বিভাগ পরিচালনা করেন) আছেন বলে আমাদের জানা নেই। আর দু'একজন যারা আছেন, তাদের কথাও অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং এ ধরণের হেলাল কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ যোগ্য নয়। সরকারের যদি জটিলতা এড়ানোর সদিচ্ছা থাকে তাহলে এক বা একাধিক এ ধরনের মুফতীকে চাঁদ দেখা কমিটির শুধু সদস্যই নয় বরং তাকেই আমীরে ফয়সালা নিযুক্ত করতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া, পৃষ্ঠা ১৪৮, খণ্ড ১৭)

(খ) শুধু ডিসিদের উপর ভিত্তি না রেখে প্রত্যেক জেলার বড় মাদরাসার দায়িত্বশীলকে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার খবর দেয়ার জন্য দায়িত্ব দিতে হবে।

(গ) চাঁদ দেখা কমিটি বর্তমানে যেভাবে চাঁদ দেখার প্রচার করেন তা শরীয়ত সম্মত হয় না এবং শরী'আতের দৃষ্টিতে তা মান্য করাও দেশবাসীর জন্য জরুরী হয় না। সুতরাং কোন্ কোন্ এলাকা থেকে কে কে চাঁদ দেখেছেন কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে রোযা বা ঈদের ফয়সালা করেছেন তা উল্লেখ করে চাঁদ দেখার ঘোষণা দিতে হবে।

(ঘ) সর্বোপরি চাঁদ দেখা না গেলে সম্ভাব্য সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তড়িঘড়ি করে সিদ্ধান্ত দেয়া বন্ধ করতে হবে। বলতে হবে এখনো শরীয়ত সম্মতভাবে চাঁদ দেখার সংবাদ পাওয়া যায়নি। আপনারা অপেক্ষা করুন । কারণ সারা দেশ থেকে এত অল্প সময়ে শরীয়ত সম্মত ভাবে খবর সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

(ঙ) যারা চাঁদ দেখার সংবাদ দেয় তাদের খবর গুরুত্ব সহকারে শুনতে হবে। বিবেচনা করতে হবে।